কাঁকড়া পালন

খুলনাপাইকগাছার কপোতাক্ষ পারের শিববাটি এলাকা। নদীর ধারের এ জায়গাটিতে অনেক ঘের, কেউ কেউ আবার পুকুরও বলে থাকে। এলাকাবাসী এসব ঘের বা পুকুরে দীর্ঘদিন ধরে কাঁকড়ার চাষ করছে। এমনই একজন চাষি রঞ্জন কুমার মণ্ডল (৩৮)।
কয়েক বন্ধুর সঙ্গে মিলেমিশে তিনি ব্যবসা শুরু করেছিলেন। যৌথ কারবারে সুবিধা করতে না পেরে নিজে হ্যাচারি করার উদ্যোগ নেন। এতেও নানা রকম বিপত্তি দেখা দেয়। এমন সময় পাইকগাছা নোনা পানি গবেষণা কেন্দ্র থেকে কাঁকড়া চাষের ওপর কয়েক দফা প্রশিক্ষণ নেন। শুরু করেন কাঁকড়া ফ্যাটেনিং বা কাঁকড়ার চাষ।

নিজের পাঁচ কাঠা জমির ওপর একটি পুকুরে তিনি কাঁকড়ার চাষ করছেন। তাও ১০-১২ বছর হবে। এই সময়ে তিনি এটাই করেন। এটাই তাঁর আয়ের একমাত্র পথ। স্ত্রী, একটি ছেলে, একটি মেয়ে এবং মাকে নিয়ে তাঁর পাঁচ সদস্যের পরিবারের ভরণপোষণ; ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ তাতেই চলে। কেমন আয় হয়-জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'আয় সব সময় সমান হয় না। কখনো বেশি হয়, কখনো কম হয়। তবে যা-ই হয়, তাতে সংসার চলে যায়।' টাকার অঙ্কে এ আয়ের পরিমাণ কেমন, জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'মাসে পাঁচ থেকে ১০ হাজার টাকা আয় হয়।'
আয়ের হেরফের সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, 'গত সপ্তাহেও (মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে) তিনি কাঁকড়া বিক্রি করেছেন প্রতি কেজি ৭০০ টাকা দরে। আর বর্তমানে (জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ) এর দাম ৪০০ টাকা। এই দাম কমে যাওয়া মানে আয় কম হওয়া। কারণ, উৎপাদন খরচ তো কমছে না, বরং দিন দিন বাড়ছে।'

এখানকার প্রায় সবাই সারা বছর কাঁকড়ার চাষ করে। তবে ১০ বছরেরও বেশি সময়ের কাঁকড়াচাষি রঞ্জন জানান, 'জ্যৈষ্ঠ থেকে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত কাঁকড়ার ভালো চাষ হয়।' অপুষ্ট কাঁকড়া, যেগুলো রপ্তানি করা যায় না, সেগুলো তিনি ফড়িয়াদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে তাঁর ঘেরে ছাড়েন। সেগুলোকে পুষ্ট করে বাজারে বিক্রি করেন। কিঙ্কর মণ্ডলও একইভাবে কাঁকড়া চাষ করেন। শিববাটি এলাকায় বিঘাখানেক জমির ওপর তাঁর সাতটি পুকুর, যাতে তিনি কাঁকড়া চাষ করে চলেছেন বছর দশেক হবে। তিনি বলেন, 'আয় খারাপ না, চলে যায়।' যেহেতু কাঁকড়া রপ্তানি হয়, সেহেতু কাঁকড়া মরে গেলে ক্ষতি বেশি। আর দাম সব সময় ওঠানামা করে। এই দাম ওঠানামা বিদেশের বাজারের কারণে নাকি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে হয়, তা তাঁরা জানেন না।

একদা যে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল নোনা পানি ঠেকানোর জন্য, পরবর্তী সময়ে সেই বাঁধ কেটে নোনা পানি প্রবেশ করিয়ে চিংড়ি চাষ শুরু হয়। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে শুরু হওয়া এই চিংড়ি চাষ ছিল বাঁধের বাইরে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার মুন্সীগঞ্জ এলাকায়। বিদেশি বাজার এবং অধিক মুনাফা থাকায় ১৯৮২-৮৩ সালের দিকে এর পসার বাড়তে থাকে। ধীরে ধীরে সাতক্ষীরা, খুলনা এবং বাগেরহাট জেলায় চিংড়ি চাষের সম্প্রসারণ ঘটে। সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত-বৈরিতা ছাড়াও নোনা পানি আটকে বছরের পর বছর চিংড়ি চাষ করায় মাটি ও পানিতে ভয়াবহ মাত্রায় লবণাক্ততা বেড়েছে। আর নোনার প্রতিক্রিয়ায় কৃষি উৎপাদনে ধস নেমেছে।

লবণাক্ততার কারণে কেউ চাইলেও সহসা এসব জমিতে চিংড়ি চাষের পরিবর্তে অন্য কিছু চাষ করতে পারে না। জমি অন্য ফসল চাষের উপযোগী হতে কমপক্ষে এক বছর সময় লাগবে এবং প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হতে হবে, যাতে বৃষ্টির পানির চাপে মাটির লবণাক্ততা ধুয়ে এবং মাটির গভীরে গিয়ে মাটির ওপরের স্তরের লবণাক্ততা কমে যেতে পারে। একবার যে জমি চিংড়ি চাষের আওতায় আসে, তা আর চিংড়ি চাষমুক্ত হতে পারে না। বরং চিংড়ি চাষের ফলে পাশের জমিও লবণাক্ততার শিকার হয় এবং ওই জমির ফসল উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পায়। এতে পরের মৌসুমে পাশের জমিতেও চিংড়ি চাষ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এভাবেই চিংড়ি চাষ এলাকার সম্প্রসারণও ঘটেছে।

এই অতিরিক্ত মাত্রার নোনা পানিতে অনেকেই কাঁকড়ার চাষ বা ফ্যাটেনিং করছেন। অবশ্য, কাঁকড়ার চাষ ও ফ্যাটেনিংয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কাঁকড়া ফ্যাটেনিংকেই চাষ নামে অভিহিত করা হয়। কাঁকড়ার চাষ বলতে ছোট আকারের কাঁকড়াকে মোহনাঞ্চলের ঘেরে তিন থেকে ছয় মাস রেখে বাজারে বিক্রি করার উপযুক্ত করাকে বোঝায়। এ ক্ষেত্রে কাঁকড়া খোলস পাল্টাবে এবং কাঁকড়ার বৃদ্ধি হবে। পক্ষান্তরে ফ্যাটেনিংয়ের ক্ষেত্রে বাজারে বিক্রির উপযুক্ত আকারের অপরিপক্ব কাঁকড়াকে দুই থেকে চার সপ্তাহ ঘেরে রেখে দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে কাঁকড়ার বিশেষ কয়েকটি জৈবিক বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়। এই সময়ে কাঁকড়া খোলস পাল্টাবে না এবং বৃদ্ধিও হবে না।

অপরিপক্ব স্ত্রী কাঁকড়ার (গোনাড পরিপুষ্টভাবে তৈরি হয়নি এমন কাঁকড়া) আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা নেই বিধায় এগুলোকে ঘেরে দুই থেকে চার সপ্তাহ রেখে ভালো খাবার সরবরাহ করা হয় যাতে এগুলো পরিপক্ব হয় অর্থাৎ গোনাড পরিপুষ্টভাবে তৈরি হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে এই পরিপক্ব স্ত্রী কাঁকড়ার চাহিদা ও মূল্য অনেক বেশি। কাঁকড়া সাধারণত মাংসাসি খাবার যেমন শামুক, ঝিনুক, চিংড়ি ও অন্যান্য কাঁকড়া এবং মাছ খেতে পছন্দ করে।

পুকুর নির্বাচন কাঁকড়ার জন্যে দো-আঁশ বা পলি দো-আঁশ মাটি সবচেয়ে ভালো। পুকুরের আয়তন ০.১-১.০ হেক্টরের মধ্যে হলে ভালো হয়। পুকুরের আয়তন ছোট হলে কাঁকড়া মজুদ করতে সুবিধা হয়। তা ছাড়া ব্যবস্থাপনার দিক দিয়েও সুবিধা। নোনা পানির উৎসস্থল যেমন_নদী বা সমুদ্রের কাছে হলে খুবই ভালো হয়। এতে জোয়ার-ভাটার সঙ্গে পানি ওঠানো-নামানো যায়। পুকুরের পানি উত্তোলনের জন্য গেট থাকা ভালো। কাঁকড়ার পলায়নপর স্বভাবের জন্য প্রায় ১ দশমিক ৫ মিটার উচ্চতার বাঁশের বানা (পাটা) দিয়ে পুকুরের চারপাশ ঘিরে ফেলা হয়। বানা প্রায় আধা মিটার মাটির নিচে পুঁতে দিতে হয়, যাতে কাঁকড়া পুকুরের পাড় গর্ত করে পালিয়ে যেতে না পারে। মাটির পিএইচের ওপর ভিত্তি করে পাথুরে চুন (CaCO3) গুঁড়া করে সারা পুকুরে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। মাটির পিএইচ ৭ থেকে ৭ দশমিক ৫-এর মধ্যে থাকলে হেক্টরপ্রতি ১২৫ কেজি পাথুরে চুন দিতে হবে। চুন ছিটানোর পর পুকুরে জোয়ারের পানি তুলতে হবে এবং সাত দিন পর হেক্টরপ্রতি ৭৫০ কেজি জৈবসার (গোবর) প্রয়োগ করতে হবে। জৈবসার প্রয়োগের তিন দিন পর হেক্টরপ্রতি ২৫ কেজি ইউরিয়া এবং ১৫ কেজি টিএসপি সার প্রয়োগ করা হয়। অজৈব সার প্রয়োগের তিন থেকে চার দিন পর পুকুরে কাঁকড়া মজুদ করা হয়।

মজুদ ও খাদ্য ফ্যাটেনিংয়ের জন্য প্রতি হেক্টর ঘেরে ১০ হাজারটি অপরিপক্ব স্ত্রী কাঁকড়া মজুদ করা যায়। কাঁকড়ার ওজন ১৮০ গ্রাম বা তার বেশি হলে ভালো হয়। কারণ এ ওজনের কাঁকড়ার দাম সবচেয়ে ভালো পাওয়া যায়। মজুদের পর কাঁকড়ার জন্য নিয়মিত খাবার দিতে হবে। কাঁকড়ার খাবার হিসেবে শতকরা ২৫ ভাগ তেলাপিয়া মাছ এবং ৭৫ ভাগ গরু-ছাগলের ভুঁড়ি অথবা শতকরা ৫০ ভাগ তেলাপিয়া মাছ এবং ৫০ ভাগ বাগদা চিংড়ির মাথা (মাংসল অংশ) প্রতিদিন পুকুরে সরবরাহ করতে হবে। কাঁকড়ার দেহের ওজনের আট ভাগ হারে প্রথম সাত দিন এবং পরবর্তী দিনগুলোতে পাঁচ ভাগ হারে খাবার সরবরাহ করলেই প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায়। ফ্যাটেনিংয়ের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি নয়, বরং গোনাডের পরিপুষ্টতাই মুখ্য বিষয়।

পানি পুকুরে কাঁকড়ার খাবার হিসেবে প্রচুর পরিমাণে প্রাণিজ মাংসল খাদ্য সরবরাহ করতে হয়, যা দ্রুত পচনশীল। তাই কাঁকড়ার পুকুরের পানির গুণাগুণ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা বেশি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার সরবরাহ করলেও পানি নষ্ট হতে পারে। পানির গুণাগুণ যাতে নষ্ট না হয় সে কারণে এবং প্রয়োজনবোধে অমাবশ্যা বা পূর্ণিমার ভরা জোয়ারের সময় চার থেকে সাত দিন কাঁকড়ার পানি পরিবর্তন করতে হবে।

স্ত্রী কাঁকড়ার গোনাড পরীক্ষা ও আহরণ কাঁকড়া মজুদের ১০ দিন পর থেকে দুই-তিন দিন পর পর কাঁকড়ার গোনাড পরিপুষ্ট হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করতে হয়। কাঁকড়াকে আলোর বিপরীতে ধরে দেখতে হবে যে, কাঁকড়ার ভেতর দিয়ে আলো অতিক্রম করে কিনা। যদি কাঁকড়ার ভেতর দিয়ে আলো অতিক্রম করতে না পারে তাহলে বুঝতে হবে গোনাড পরিপুষ্ট হয়েছে। বিপরীতে গোনাড পরিপুষ্ট না হলে কাঁকড়ার দুই পাশের পায়ের গোড়ার দিক দিয়ে আলো অতিক্রম করবে। সাধারণত গোনাড পরিপুষ্ট হলে পুকুরে পানি ওঠানোর সময় কাঁকড়া গেটের কাছে চলে আসে। পুষ্ট কাঁকড়া স্কুপনেট বা টোপ দিয়ে প্রলুব্ধ করে ধরতে হবে। কাঁকড়া সম্পূর্ণভাবে আহরণের জন্য পুকুরের পানি নিষ্কাশন করতে হবে। ধরার সঙ্গে সঙ্গে কাঁকড়াকে বিশেষ নিয়মে বেঁধে ফেলতে হবে। অন্যথায় কাঁকড়ার চিমটা পা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। খুলনার পাইকগাছা ও সাতক্ষীরার দেবহাটায় কাঁকড়া চাষ বা ফ্যাটেনিং বহুল প্রচলিত। অনেক মানুষই এখন বিকল্প আয়ের চিন্তা থেকে কাঁকড়া ফ্যাটেনিং বা কাঁকড়ার চাষ করছে। তাদের

আয়ও খারাপ হচ্ছে না।

বর্তমান কাঁকড়া চাষের পরিস্থিতি, বাজার ও প্রতিবন্ধকতা এখনও পর্যন্ত যথার্থভাবে কাঁকড়া চাষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি, যথাযথ প্রশাসনিক নীতি এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শদান, আর্থিক সহায়তার সঠিক প্রয়োগের অভাবে বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত খুব অল্প জলাশয়েই কাঁকড়া চাষ হয়ে থাকে। সঠিক নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যিক সম্ভাবনার দরজা খুলে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু তার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এই মুহূর্তের জরুরী।

(১) কৃত্রিম ভাবে কাঁকড়ার ডিম ফোটানোর ব্যবস্থা করা, যাতে কাঁকড়া মজুতের সময় জোগান স্বাভাবিক থাকে।
(২) ৪০-৮০ গ্রামের জুভেনাইল কাঁকড়াগুলিকে বাজারে সরাসরি (দালালের মাধ্যমে নয়) বিক্রযোগ্য করে তোলা। আমরা সুন্দরবনে সামুদ্রিক কচ্ছপ ও অন্যান্য জীববৈচিত্রের উপস্থিতি সমীক্ষা করে দেখার সময় দেখা গেছে প্রতি বছর শীতকালীন অস্থায়ী বাজার তৈরী হয় বিভিন্ন খালের মুখে, সপ্তমুখীর কাছে। বাজার মানে দু-তিনটি নৌকা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে।এই সব নৌকার কাঠের পাটাতনের তলায় বরফ রাখা থাকে। কাঁকড়াধরারা বাঘের ভয়, কুমিরের ভয়, সাপের কামড়ের ভয় সাথে করে সারাদিন সারারাত খাঁড়িতে বসে কাঁকড়া ধরে, তারপর অল্প কিছু টাকার বিনিময়ে নৌকাশুদ্ধ কাঁকড়া বিক্রি করে দেয় এই সব অস্থায়ী ভাসমান বাজারে। অন্যান্য মাছ ধরা নৌকাগুলোও তাদের মাছ এখানে বিক্রি করে। এখান থেকে Middle Man বা দালালদের মাধ্যমে রূপালি ফসল পৌঁছায় বাজারে। জীবনের কোনরকম ঝুঁকি ছাড়াই এই মধ্যবর্তী বিক্রেতারা প্রকৃত মাছমারাদের থেকে দ্বিগুন লাভ লুটে নেয়। তাই সরকারি তরফ থেকে Co-operative তৈরী করে এদের আর্থিক অনুদান দিয়ে নিজেদের বাজার নিজেরাই যাতে তৈরী করতে পারে তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
(৩) সদ্য খোলস ছাড়া কাঁকড়া যা ওয়াটার ক্র্যাব নামে পরিচিত এবং অপরিণত স্ত্রী কাঁকড়াগুলিকে প্রজনন অবস্থা পর্যন্ত পালন করা বা ফ্যাটনিং করার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা।
(৪) রপ্তানিযোগ্য কাঁকড়াগুলির সঠিক বাজারের ব্যবস্থা করা। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে স্বাস্থ্যসম্মত বাজার, রাস্তা ও মিষ্টি জলের ব্যবস্থা আরও রপ্তানিকারকদের ডেকে নিয়ে আসবে- এটা নিশ্চিত।
(৫) জীবিত অবস্থায় ও প্রক্রিয়াজাত অবস্থায় কাঁকড়ার সঠিক রপ্তানীর ব্যবস্থা করা।এর জন্য ইনস্যুলেটেড/পারফোরেটেড অর্থাত ছিদ্রছাড়া এবং ছিদ্রযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা প্রয়োজন। প্রয়োজন ছোট ছোট দ্বিচক্রযানের (Two wheller) গাড়ী যা কিনা শুধুমাত্র এই ফসল পরিবহনের জন্য বিশেষভাবে নক্সা করা।

কাঁকড়া চাষের সতর্কতা (১) কাঁকড়া চাষের পুকুরের তলায় জমে থাকা বিষাক্ত ক্ষতিকর গ্যাস শুষে নেওয়ার জন্য উপযক্ত রাসায়নিক ব্যবহার করতে হবে। জিওলাইট প্লাস দিতে হবে প্রতিটি ফ্যাটিনিং চাষের পর। এরা যেহেতু জীবিত খাবার এবং প্রোটিনযুক্ত খাবার খায় ফলতঃ খামারের তলায় অভুক্ত খাবার থেকে গ্যাস তৈরী হতে পারে। উপযুক্ত রাসায়নিক দিয়ে সেই অবাঞ্ছিত গ্যাসকে শোষণকরা সম্ভব হবে। প্রতি দু'বার ফসল তোলার পর পুকুরের তলায় জমে থাকা পলি তুলে ফেলে CaO বা পাথুরে চুন দিয়ে সাতদিন পুকুর ফেলে রাখার পর আবার জল ঢোকাতে হবে।
(২) কাঁকড়া গর্ত কেটে একস্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যেতে পারে। এই স্থানান্তর এড়াতে স্লুইশ গেট সহ খামারের চারদিকে বাঁশের পাটা ও নাইলন জালের বেড়া দিতে হবে, যা মাটির নিচে অন্ততঃ ২ফুট এবং মাটির উপরে অন্ততঃ ৩ফুট থাকবে। প্লাস্টিক সীট পাড়ের ওপর দিয়ে তার ওপর মাটি দিয়ে পাড় তৈরী করলেও কাঁকড়া পাড় ফুটো করে চলে যেতে পারবে না।

যেহেতু কাঁকড়া একে অপরকে খেয়ে ফেলতে পারে এই প্রবণতা এড়ানোর স্বর্থে নিয়মিত অতিরিক্ত খাদ্যের যোগান রাখা জরুরী। খোলক যত তাড়াতাড়ি শক্ত হবে ততই বিক্রয় উপযোগী হবে, সেই কারণে জলের গুণাগুণ উপযুক্ত মাত্রায় রাখা জরুরী। খামারে নরম কাঁকড়াগুলির প্রয়োজনীয় লুকানোর জায়গা রাখা জরুরী। ভাঙ্গা পাইপ, অব্যবহৃত টায়ার ইত্যাদি ব্যবহৃত হতে পারে লুকানোর আস্তানা হিসাবে, ১৫ সেমিঃ ব্যাসার্ধের লম্বা পাইপের টুকরাগুলি খামারের তলদেশে ছড়িয়ে রাখতে হবে। খামারের মাঝখানে উঁচু মাটির ঢিবি বানিয়ে তাতে লবণাম্বু উদ্ভিদের কিছু চারা যেমন বাণী, হেঁতাল, গেঁওয়া লাগালে কাঁকড়া যেমন স্বচ্ছন্দ বোধ করে তেমনি জলের অতিরিক্ত খাদ্য শোষণ করে নিয়ে জলকে দূষণমুক্ত রাখে। কাঁকড়া বিক্রিযোগ্য হলে গোণ বা কোটাল-এর সময় আঁটেলি বসিয়ে তা ধরা যেতে পারে অথবা দোন লাগিয়েও ধরা হয়।

কাদা কাঁকড়ার পরিবহন ফসল আহরণ পরবর্তী পরিবহন- আহরিত কাঁকড়া বাজারে নিয়ে যাবার আগে প্রতিটিকে বাঁধা হয় সরু নাইলন বা প্লাস্টিকের দড়ি অথবা ভিজে খড় দিয়ে, তার পরে ঝুড়িতে রাখা হয়। ঝুড়িগুলি ভিজে চটে বস্তা চাপা দেওয়া থাকে। যাতে জলীয়ভাব বজায় থাকে। এই ধরণের ঝুড়িতে যত বেশি বাতাস চলাচল করবে, তত বেঁচে থাকার হারও বাড়বে। পরিবহনের সময় জলীয়ভাব ঠিক রাখতে পারলে এক সপ্তাহ পর্যন্ত কাঁকড়াগুলি বেঁচে থাকে সর্বোপরি পরিবহনের সময় কখনই সরাসরি সূর্যের আলো না পড়াই ভালো।

৫০ সেমিঃ ব্যাসার্দ্ধের একটি ঝুড়িতে প্রায় ৩০০-৫০০ গ্রাম কাঁকড়া (যার ক্যারাপেস ২.৫ সেমিঃ চওড়া) পরিবহন সম্ভব।
যেহেতু শ্যাওলা/ ঝাঁঝি পচনশীল তাই অনেকসময় দূরবর্তী স্থানে ১০০% জীবিতপরিবহনের স্বার্থে মোহনার জলে তুলা ভিজিয়ে কাঁকড়া পরিবহনের ঝুড়িতে দিলে কাঁকড়ার নড়াচড়াও বন্ধ হবে। ভিজে কাঠের ভূষি প্রয়োগ করেও সুফল পাওয়া যায় কাঁকড়া রপ্তানীর ক্ষেত্রে। ৫০-১২০মিমি. চওড়া তার প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে আহরণের পর খোলামুখ পাত্রে ২০-৫৩ কিমি. সড়কপথে পরিবহন করে ৫৫-১০০% বাঁচার হার লক্ষ্য করা গেছে।

বিশ্বকৃষি এবং খাদ্য সংস্থা (FAO) এর ১৬২ নং ধারা অনুযায়ী ২০০ গ্রামের কম এবং ১০ সেমি. এর কম চওড়া ক্যারাপেসওলা কাঁকড়া রপ্তানী যোগ্য নয়।
কাঁকড়ার মোট ওজনের ৩৬-৩৮% দাঁড়া ও পা। ২২-২৪% খোলক, দেহের বাকী অংশে প্রাপ্ত মাংস ২৯-৩৬%। আবার দাঁড়া ও পা-এর মধ্যে মাংসের পরিমাণ ৩৩-৪২%, যা পুরোটাই মাংসজ প্রোটিন হিসাবে

খাওয়ার যোগ্য। মাংসের মধ্যে ভাল মাত্রায় প্রোটিন ও মুক্ত আমিনো আসিড আছে। প্রসেসিং সেন্টারে প্রাপ্ত কাঁকড়ার খোলস থেকে যে সমস্ত ব্যবসায়িক গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক পাওয়া যায় সেগুলি হল কাইটিন, কাইটোসান এবং গ্লুকোস আমিনো হাইড্রোক্লরাইড, বিশ্বের বাজারে যার মূল্য অপরিসীম।

কাইটিন কাইটিন একটি প্রাকৃতিক জৈবরাসায়নিক পদার্থ যা আদপে শর্করার দীর্ঘশৃঙ্খল। বিভিন্ন প্রাণীর (যেমন চিংড়ি, কাঁকড়াইত্যাদির) বহিঃকঙ্কালে (খোলক) এটি প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত থাকে। জাপানে কাইটিন খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হয়। রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা বাড়াতে, বার্ধক্যের বিলম্বিত করতে, আরোগ্য লাভের পথে এবং জৈবছন্দ নিয়ন্ত্রণে রাখতে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

উৎস- কবচী প্রাণীর খোলকই এর প্রধান উৎস। প্রকৃতপক্ষে কাঁকড়া ও চিংড়ির Processing Industry-র উদ্বৃত্ত খোলকজাত দূষণ নিয়ন্ত্রণের চিন্তা থেকেই কাইটিন শিল্পের ধারণা জন্মায়। বাগদার মাথার খোলকে ৩৯ শতাংশ এবং দেহের খোলকে ৩৬.৫ শতাংশ কাইটিন বর্তমান। কাদা কাঁকড়ার (Scylla serrata) দেহের খোলকে ১১.৭ শতাংশ, দাঁড়ায় ১০.৪ শতাংশ এবং উপাঙ্গে ১৬.১ কাইটিন পাওয়া যায়।

প্রস্ততি পদ্ধতি- কবচী প্রাণীর খোলকে কাইটিন ছাড়াও খনিজ পদার্থ ও প্রোটিন থাকে। প্রস্তুত প্রণালীর নীতি হল কাইটিনকে বাকী পদার্থ থেকে আলাদা করা।
১) প্রথমে কাঁকড়ার খোলাকে গুঁড়ো করা হয়।
২) গুঁড়ো পদার্থকে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দিয়ে বিক্রিয়া ঘটানো হয়। বিক্রিয়াজাত পদার্থকে ভাল করে ধুয়ে নেওয়া হয়। এর ফলে প্রোটিন পদার্থ মুক্ত হয়।
৩) এর পর হাইড্রোক্লোরিক আসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ার খনিজ পদার্থকে আলাদা করা হয়।
৪) বিক্রিয়াজাত পদার্থ ধুয়ে আলাদা করে শুকিয়ে প্যাকিং করে রাখা হয়। এইভাবে প্রাপ্ত কাইটিন বহুদিন সংরক্ষণ করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র উপকূলে নানা প্রজাতির কাঁকড়া পাওয়া যায় যার মধ্যে কাদা কাঁকড়ার চাষ করা লাভজনক। বিশ্ববাজারে কাদা কাঁকড়ার চাহিদাও প্রচুর। এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে কাদা কাঁকড়া বা মেকো পাওয়া যায়। এগুলোকে সংগ্রহ করে দুধরনের কাঁকড়া চাষের মডেল খামার করা সম্ভব হয়েছে।
সুন্দরবন এলাকায় জোয়ারভাটা প্লাবিত অঞ্চলে মাঝারি আকৃতির পুকুর (৪০মি.-৫০মি. লম্বা এবং ২০মি.- ২৫মি. চওড়া) খুঁড়ে খামার তৈরী করা হয়েছে। এইভাবে খনন করা পুকুরের মাঝে একটি চর রাখা প্রয়োজন যা পুকুরের তলদেশে গিয়ে মিশবে। চরটির নীচের আয়তন হবে ৮মি.x৪মি. এবং জলের ওপর জেগে থাকা পৃষ্ঠের আয়তন হবে ৪মি.x২মি.। পুকুরের চারপাশ ভালভাবে বাঁশের বেড়া বা নাইলনের জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়া দরকার। একপাশে একটি জলবাহি নালা ও অপরপাশে নির্গমন নালা থাকবে ও এদের মুখ বাঁশের জাল দিয়ে আটকান থাকবে। জোয়ারের সময় জল জলবাহী নালা দিয়ে পুকুরে আসবে। পুকুরের মাঝের চরটির উচ্চতা এমন হবে যেন জোয়ারের সময় চরটি ডুবে যায় ও অন্য সময় জেগে থাকে। এই এলাকাতে কাঁকড়ারা গর্ত করে থাকে ও তাদের খাবার দেওয়া হয়। চর এলাকা ও পুকুরের চারপাশে কয়েকটি লবণাম্বু উদ্ভিদ (ম্যানগ্রোভ) লাগানো দরকার, এতে কাঁকড়ার স্বাভাবিক বাসস্থান তৈরী হয়। এক্ষেত্রে জলের গভীরতা ১.৫মি.-২মি. রাখা দরকার।

২-৩ সেমি. আকারের শিশু কাঁকড়া বিঘা প্রতি ৬০০-৬৫০টি চাষের পুকুরে ছাড়া হয়। লবণাক্ততা থাকা উচিত ৫-২০ পি.পি.টি.।
যেহেতু এরা খাবার না থাকলে একে অপরকে খেয়ে ফেলে তাই নিয়মিত এদের খাবার দেওয়া দরকার। কাঁকড়া নিশাচর প্রাণী বলে সন্ধ্যার দিকে খাবার দেওয়া ভাল। এছাড়া জোয়ারের জলেও প্রচুর পরিমাণে কাঁকড়ার খাবার ভেসে আসে।
কাঁকড়ারা ৫-৬ মাসে ২৫০-৩০০ গ্রাম ওজন লাভ করে তখন এদের ধরে বিক্রী করা যায়।
কাদা কাঁকড়া ৫-৫০ পি.পি.টি. লবণাক্ততা সম্পন্ন জলে বেঁচে থাকতে পারে। কাঁকড়া চাষের জন্য যে জলাশয় নির্দিষ্ট করা হয় তাতে জোয়ার ভাঁটার আনাগোনা থাকলে ভাল।

কাঁকড়ার খোলক শক্তকরণ চাষ (নরম কাঁকড়ার শক্ত হওয়া) এই ধরনের চাষের ক্ষেত্রে সদ্য খোলক বদলেছে এমন নরম কাঁকড়া সংগ্রহ করে তাদের ২০-৩০ দিন খামারে প্রতিপালন করা হচ্ছে। এর ফলে কাঁকড়ার খোলক শক্ত হয় এবং পুরুষ কাঁকড়া মাংসে ও স্ত্রী কাঁকড়া ডিম্বাশয়ে পরিপূর্ণ হয়। এই অবস্থায় কাঁকড়াগুলো বিভিন্ন রপ্তানীকারক সংস্থা কিনে নিচ্ছে। কাঁকড়ার খোলক শক্তকরণ খুবই লাভজনক, কারণ অতি অল্পসময়ে কম বিনিয়োগে প্রচুর লাভ করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পরিপক্ক স্ত্রী কাঁকড়ার বাজারদর পুরুষ কাঁকড়ার চেয়ে অনেক বেশী।

প্রকল্পাধীন খামারে চাষীরা নরম কাঁকড়া স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করে প্রতিবর্গ মিটারে ২-৩টি করে কাঁকড়া ছাড়েন। স্ত্রী ও পুরুষ কাঁকড়া আলাদা আলাদা পুকুরে ছাড়া হয়। ছাড়ার সময় স্ত্রী কাঁকড়াগুলি ১৮০-২০০ গ্রাম ও পুরুষ কাঁকড়াগুলির ওজন ৩০০ গ্রাম ছিল। কাঁকড়াগুলিকে দৈনিক দেহের ওজনের ১০% হারে খেতে দেওয়া হচ্ছে। এই খাবার দুবার দেওয়া হচ্ছে। খাবারের মধ্যে মূলত শুকনো ও পরিত্যক্ত মাছ ও মাছের টুকরো ব্যবহার করা হয়েছে। নিয়মিত জল পরিবর্তন"খোলক শক্তকরণ" চাষের অত্যন্ত জরুরী বিষয়। মাঝে মাঝে,চুন ও জিওলাইট প্লাস ও পুকুরে দেওয়া হয়। দুটি চাষের মাঝে ১৫-২০ দিন অন্তর রাখা দরকার। সম্ভব হলে পুকুর শুকিয়ে পাঁক তুলে দেওয়া দরকার। নতুন জল ঢোকানোর পর জলের লবনাক্ততা, পি.এইচ., দ্রবীভূত অক্সিজেন ইত্যাদি দেখে কাঁকড়া ছাড়তে হবে।

কাঁকড়ার বৃদ্ধিকরণ চাষ দেড় থেকে দুইঞ্চি সাইজের শিশু কাঁকড়া স্থানীয় সংগ্রহকারীদের কাছ থেকে কিনে খামারের পুকুরে প্রতি বর্গ মিটারে ৪টি সংখ্যায় ছাড়া হচ্ছে। কাঁকড়াগুলিকে দিনে দুবার শুকনো ও পরিত্যক্ত মাছ খাবার হিসাবে দেওয়া হচ্ছে। তিন খেকে চার মাসে কাঁকড়াগুলি ২০০-২৫০ গ্রাম ওজন প্রাপ্ত হলে তাদের বাজারজাত করা হচ্ছে।
কাঁকড়ার একটি বৈশিষ্ট্য হল একে অপরকে খেয়ে ফেলা। সেজন্য চাষের পুকুরে কাঁকড়ার লুকোবার জায়গা হিসাবে পি.ভি.সি. পাইপ, ফাঁপা বাঁশের টুকরো ইত্যাদি রাখা হয় যাতে তারা আক্রমণকারী কাঁকড়ার

থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় নিতে পারে। কাঁকড়া খামারের পুকুরগুলির চারপাশের নাইলন জাল ও পলিথিন শীট দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। এছাড়া কাঁকড়াগুলিকে ছাড়ার আগে ০.৫% মিথিলিন ব্লু দ্রবণে দশমিনিট ডুবিয়ে নিয়ে তবে ছাড়া হয়। এর ফলে কাঁকড়ার দেহে কোন রোগ জীবাণু থাকলে তা খামারের জলে সংক্রমণ হবার আশঙ্কা থাকে না। প্রতিটি কাঁকড়া খামারে জল পরিবর্তনের ব্যবস্থা ছিল।